হাল্লারাজার সেনা

সোনার কেল্লায় জয়সলমিরে ট্রেন আর উটের দৃশ্য তুলতে গিয়ে কী ঝক্কি পোয়াতে হয়েছিল সেটা তোমাদের বলেছি। সেখানে উট ছিল মাত্র পাঁচটা। আর গুপী গাইন ছবিতে হাল্লার সেনার দৃশ্য তুলতে আমাদের কত উটের দরকার হয়েছিল জান ? এক হাজার। আর সেনা মানে তো শুধু উট নয়, তার জন্য সোয়ার চাই ; আর শুধু সোয়ার হলেও চলে না— তাদের জন্য চাই সৈন্যের সাজ-পোষাক ঢাল তলোয়ার বল্লম নিশান পায়ের নাগরা, সব কিছুই। এই সব জোগাড় হলে পরে তাদের নিয়ে শুটিং। সত্যি বলতে কি, এরকম বিরাট শুটিং এর আগে আমরা কখনও করিনি। তাই এটা হয়েছিল আমাদের সকলের পক্ষেই চিরকাল মনে রাখার মতো একটা ঘটনা। এই শুটিং-এর বিষয় আজ তোমাদের কিছু বলব।

সন্দেশে পড়া উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন' গল্প থেকে যখন 'গুপী গাইন' ফিল্ম করার জন্য চিত্রনাট্য লিখি, তখন হাল্লার দৃশ্য ভারতবর্ষের কোথায় তোলা হবে তা ঠিক ছিল না, তবে এটা মাথায় ছিল যে হাল্লার সৈন্য হবে অশ্বারোহী। ট্রেনে আর মোটরে করে নানান জায়গা ঘুরে দেখতে দেখতে অবশেষে যখন রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে মরু অঞ্চলের জয়সলমির শহরে পৌঁছলাম, তখন মনে হল হাল্লার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না। অথচ রাজস্থানের এই অঞ্চলে ঘোড়া নেই, আছে উট। তাই অশ্ববাহিনী হয়ে গেল উষ্ট্রবাহিনী।

কিন্তু খাতায় ঘোড়া কেটে উট লিখে দিলেই তো আর কাজ ফুরিয়ে গেল না, বরং এটা হল কাজের শুরু। এর পরে আছে অনেক হিসেব, অনেক প্ল্যানিং, অনেক তোড়জোড়। হাল্লার সৈন্যদের জন্য সাজ পোশাকের নকশা করতে হবে। তার মানে মাথার পাগড়ি থেকে পায়ের

নাগরা পর্যন্ত সব কিছু চাই, তা ছাড়া আছে ঢাল, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ, বল্লম, পতাকা। সেনাপতির জন্য আবার চাই একটু বিশেষ ধরনের পোশাক, বর্ম, আর শিরস্ত্রাণ।

এই সব কিছুর নকশা করে জিনিসগুলো তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়েছিল বোম্বাইয়ের এক কোম্পানিকে, যারা অনেকদিন থেকে ফিল্মে ব্যবহারের জন্য এসব জিনিস তৈরি করে আসছে। হাজারের কমে সেনাবাহিনী বোঝানো যাবে না এই আন্দাজ করে প্রত্যেকটা জিনিসই তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল হাজারটা করে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এসব তৈরি করে চারটি লরির পিঠে ট্রাঙ্ক বোঝাই করে তুলে দেওয়া হবে। সেই লরি বোম্বাই থেকে জয়সলমিরে এসে পৌঁছলে পর তবে আমাদের হাল্লার সেনার শুটিং হবে।

এখন কথা হচ্ছে, উট জিনিসটা তো রাজস্থানের মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে দেখা যায়, কিন্তু মালিক সমেত হাজার উট ঠিক যেদিন চাইব সেদিন শুটিং-এর জায়গায় জমায়েত হবে কী করে ?

ঠিক হল এ ব্যাপারে জয়সলমিরের রাজার সাহায্য চাওয়া হবে। আমার জওহরনিবাস বলে যে বাড়িটায় আস্তানা করেছিলাম, তার দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে উত্তর দিকে চাইলেই রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। আমি ও আমাদের দলের আরও জনাচারেক লোক আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক সকালে গেলাম রাজার সঙ্গে দেখা করতে। মানুষটিকে দেখে রাজা বলে বোঝার উপায় নেই ; অন্তত রাজপুত রাজা বলতে গোঁফ-গালপাট্টা সমেত যে জাঁদরেল চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে এনার চেহারার কোনই মিল নেই। কিন্তু ইনি যে ক্ষমতা রাখেন সেটা তাঁর কথাতেই বোঝা গেল। আমাদের ব্যাপারটা শুনেটুনে বললেন 'হাজার উট ? সে আর এমন কি কথা ; কুমার বাহাদুরকে বললেই ও ব্যবস্থা করে দেবে।'

কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আগেই। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবক, মোটর সাইকেলে ফট্ ফট্ করে রাস্তায় বালি উড়িয়ে ঘুরে বেড়ান, সম্পর্কে রাজার কিরকম যেন ভাই। তাঁকে অনুরোধ করতে তিনি সানন্দে উটের ব্যবস্থা করার ভার নিলেন। জয়সলমিরে ফিল্মের শুটিং হবে শুনে তিনি এমনিতেই ভারি মেতে উঠেছিলেন।

তোমাদের মধ্যে যারা গুপী গাইন ছবি দেখেছ, তারা জান যে হাল্লার সেনাকে নিয়ে একটি মাত্র দৃশ্যই আছে— যদিও সে দৃশ্য বেশ ঘটনাবহুল। হাল্লারাজ শুণ্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এক বিশেষ দিনে সৈন্য জমায়েত হয়েছে। উট ও সেনা দুইই আপাতত মাটিতে বসা,

সেনাপতি তাঁর উটের পিঠ থেকে হুকুম করলেন— 'উট উঠাও !'—কিন্তু আধপেটা খাওয়া সৈন্যদল হুকুম না মেনে বসেই রইল। সেনাপতি হন্তদন্ত হয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা রিপোর্ট করলেন, মন্ত্রী অগত্যা যাদুকর বরফির শরণাপন্ন হলেন। বরফি মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্রবলে সৈন্যদের উটের পিঠে চড়িয়ে দিলেন। সৈন্য রওনা দেয়, এমন সময় গুপী-বাঘা হারানো ঢোল ও জুতোর সন্ধান পেয়ে ঝড়ের মতো এসে 'ওরে হাল্লারাজার সেনা' গান গেয়ে সেনাবাহিনীকে রুখে দেয়। গানের শেষে আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নেমে আসে, বুভুক্ষু সেনা উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে গোগ্রাসে মণ্ডামিঠাই মিলতে থাকে। মন্ত্রীমশাইও একটি হাঁড়ি নিয়ে সটকাবার তাল করছিলেন, কিন্তু তাঁরই সেনার পায়ের তলায় সে হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই হুলুস্থুলের মধ্যে এক ফাঁকে গুপী বাঘা হাল্লারাজাকে তুলে নিয়ে শুণ্ডীর উদ্দেশে হাওয়া হয়ে যায়। এই সৈন্য সমাবেশের দৃশ্য তোলার জন্য একটা চমৎকার জায়গা বাছা হয়েছিল কেল্লার পূবদিকে। তিন দিকে ধুধু প্রান্তর, গাছ-পালার চিহ্নমাত্র নেই, আর জমিতে বালি থাকলেও তা মোটেই গভীর নয়— অর্থাৎ পা বসে যায় না, তাই চলতে ফিরতে কোনও অসুবিধা নেই। উত্তরদিকে মাইল খানেক জায়গা জুড়ে পাঁচিলের মতো খাড়াই উঠে গেছে পাথুরে পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথাটা আবার সমতল। এরই একটা অংশে একাদশ শতাব্দীতে ভাটি রাজপুতরা বানিয়েছিল তাদের কেল্লা। এই ধরনের পাহাড়—যাকে ইংরাজিতে বলে table mountain —রাজস্থানের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। চিতোরের দুর্গ ও শহরও এইরকমই একটা মাথা-চাঁছা পাহাড়ের উপর তৈরি।

শুটিং-এর জায়গার একটা অংশে ছিল প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র। প্রায় দুশো গজের মতো জায়গা জুড়ে নানান আকারের হলদে পাথরের সমাধিস্তম্ভে জায়গাটা ভরা। এটা দেখার পর ঠিক করেছিলাম গুপী যেখানে গাইতে গাইতে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে আসছে, সেখানে 'মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে, রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল'—এই অংশটায় গুপী-বাঘা হাঁটবে এই সমাধি ক্ষেত্রের উপর দিয়ে।

শুটিং-এর দিন সকালে জওহর নিবাসে খবর এল মালিক সমেত এক হাজার উট যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছে। আমরা সকলে একসঙ্গে নিশ্চিন্তির হাঁফ ছাড়লাম। দুদিন আগেই বোম্বাই থেকে লরিতে করে সাজ-পোশাক এসে গেছে, এবং ইতিমধ্যে ট্রাঙ্ক থেকে সে সব পোশাক অস্ত্রশস্ত্র পাগড়ি বল্লম পতাকা সব কিছুই বার করে এক এক করে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। এইসব জিনিস এখন পাঠিয়ে দেওয়া হল দু'মাইল

দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে। হাল্লার সেনাকে সাজ পরানো তো কম কথা নয়। এর জন্য আমাদের দলে জনা দশেকের বেশি লোক নেই। আমরা আন্দাজ করেছিলাম ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে কাজটা সারতে। সকালে অন্য শুটিং রাখা হয়েছে; সেটা সেরে দুপুর দুটো নাগাদ আমরা হাজির হব যুদ্ধক্ষেত্রে। তখন থেকে শুরু করে ঘণ্টা চারেক শুটিং অনায়াসে করা যাবে, কারণ মাসটা হল মার্চ— রোদ থাকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত।

আমাদের দলে লোক ছিল সবশুদ্ধ জনা চল্লিশেক। অভিনেতাদের মধ্যে গুপী বাঘা বাদে ছিল হাল্লার রাজা (সন্তোষ দত্ত), হাল্লার মন্ত্রী (জহর রায়), সেনাপতি (শান্তি চট্টোপাধ্যায়), গুপ্তচর (চিন্ময় রায়), জনা পাঁচেক পেয়াদা (কামু মুখার্জি, অশোক মিত্র, রাজকুমার লাহিড়ি ইত্যাদি)। এ ছাড়া ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, মেক-আপম্যান, এঁদের সকলের সহকারী, আমার নিজের চারজন সহকারী, আলো রিফ্লেক্টর ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম বইবার লোক, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও তাঁর দলের লোক ইত্যাদি মিলিয়ে আরও জনাত্রিশেক। এর মধ্যে এক জহর রায় ছাড়া আমরা আর সকলেই আগে আগে একসঙ্গে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছি। জহর রায় আসবেন কলকাতার একটা শুটিং শেষ করে। যোধপুর থেকে দেড়শো মাইল ট্যাক্সিতে আসবেন। জয়সলমির এসে পৌঁছনোর কথা রাত দশটায়, এলেন মাঝরাত্তিরে, আড়াইটার পর। কী ব্যাপার ? জানা গেল মাঝপথে নাকি চলন্ত ট্যাক্সি উল্টে গিয়েছিল। জহরবাবুর নাক যে জখম হয়েছে সেটা চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম। বললেন, 'আরে মশাই— চাঁদনি রাত, ষাট মাইল স্পিডে চলেছি, দিব্যি পিচ ঢালা সোজা রাস্তা, অন্য গাড়ির চলাচল নেই—সর্দারজি ড্রাইভার বাঁ হাত কাঁধের পিছনে রেখে ডান হাতে আপেল নিয়ে তাতে কামড় দিচ্ছেন, স্টিয়ারিং-এ রেখেছেন নিজের ভুঁড়িটা। সেটাকে একটু এদিক ওদিক করলেই গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরছে। এমন সময় হুশ্ করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেল খরগোশ। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি গেল উল্টে। আমার হুঁশ ছিল, দেখলাম আমি গড়াচ্ছি, আর আমার পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে দুটো হোল্ডঅল। খটকা লাগল—হোল্ডঅল তো সঙ্গে একটি, অন্যটি এল কোত্থেকে ? বুঝলাম ওটি হলেন আমাদের সর্দারজি।'

আশ্চর্য এই যে, জহরবাবু, ড্রাইভার সাহেব ও গাড়ি, এই তিনটের কোনওটাই খুব বেশি জখম হয়নি। ফলে হাল্লার সেনার দৃশ্যে অ্যাকটিং করতে জহরবাবুর বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

অভিনেতা বাদে এই যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন লোক, একটা বড় রকমের শুটিং হলে এদের সকলকেই কাজে লেগে যেতে হয়। হলিউড বা বিলেত বা বোম্বাই হলে হাজার উট সমেত হাল্লারাজার সেনার এই দৃশ্য

তুলতে মাইনে করা কাজের লোক থাকত অন্তত শতিনেক। সেখানে আমাদের কাজ চালাতে হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে। তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে ভোর চারটে থেকে, যাতে নাকি সাড়ে ছটার মধ্যে শুটিং-এর জায়গায় পৌঁছে সাতটার মধ্যে শট্ নেওয়া শুরু করে দেওয়া যায়। সকাল আর বিকেলের রোদটা ফোটোগ্রাফির পক্ষে সবচেয়ে ভাল, তাই সেটা মাঠে মারা গেলে চলে না।

আজ অবিশ্যি আমরা সকলে অন্য জায়গায় হালকা কাজ রেখেছিলাম, কারণ জানতাম বিকেলে ঝক্কি আছে। সকালে শুটিং শেষ করে বারোটা নাগাদ জওহর নিবাসে ফিরে এসে স্নান খাওয়া এবং সামান্য বিশ্রাম সেরে দুটোয় গিয়ে হাজির হলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। উটের বহর আর বাহার দেখে চোখ মন একসঙ্গে জুড়িয়ে গেল। রাজস্থানের সব উটওয়ালাদের কাছেই ঝালর দেওয়া কড়ি বসানো চমৎকার সব রঙিন উটের পোশাক আর জাজিম থাকে। এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন উটগুলোকে সাজপোশাক পরিয়ে নিয়ে আসে।

উট তো হল, কিন্তু সৈন্যদের এ চেহারা কেন? কোথায় গেল আমাদের লাল নীল হলদে পোশাক, আর কোথায় গেল সেই বাহারের উষ্ণীষ? আর হাজার জোড়া নাগরা যে কেনা হল, সেগুলোই বা এরা পরেনি কেন? এতো দেখছি সবাই সাধারণ সাদা পোশাক পরে বসে আছে, যেমন সব সময়েই থাকে।

জিগ্যেস করে আসল কারণটা জানা গেল। উটওয়ালাদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান, আর মুসলমানদের নাকি সাদা ছাড়া আর কোনও রঙে ঘোর আপত্তি। বোম্বাইয়ের তৈরি বাহারের পোশাক দেখে তারা কেউ কেউ হেসেছে, কেউ কেউ বিশ্রী ভাবে ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়েছে, আবার কেউ সে পোশাক হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন উপায়? এদের ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাতে হয়, নইলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

কিন্তু এক হাজার লোককে একসঙ্গে বোঝানোর কোনও উপায় আছে কি? আছে। খোলা মাঠে ভিড় নিয়ে কাজ করতে হবে জেনে আমরা কলকাতা থেকে আসার সময় সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একটা ব্যাটারি অপারেটেড লাউডস্পিকার কিনে এনেছি। এ জিনিস তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ— কাঁধে ঝোলানো ব্যাটারির সুইচ টিপে একটা চোঙার মতো জিনিস মুখের সামনে ধরে কথা বললেই গলার স্বর অনেকগুণ বেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

ডাক পড়ল তিনু আনন্দের। তিনু আমার চারজন সহকারীর

একজন। সে বোম্বাই থেকে এসেছে, তার ভাষা হিন্দি— যদিও বাংলাও ভাঙা ভাঙা বলতে পারে এবং চটপট শিখে নিচ্ছে। লাউডস্পিকারটা তিনুর হাতে দিয়ে তাকে শিখিয়ে দিলাম উটওয়ালাদের কী বলতে হবে। বললাম, 'বলো— তোমরা এখন আর উটওয়ালা নও, তোমরা হচ্ছ সৈন্য। তোমরা সবাই এক-একজন বীর যোদ্ধা। তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। তোমাদের উটের এত বাহার, তোমাদের সেনাপতি এত বাহারের পোশাক পরেছে, তোমরাও যদি রঙিন পোশাক পরে হাতিয়ার নিয়ে উটের পিঠে চড়, তবেই না তোমাদের খুবসুরৎ দেখাবে, বীর বলে মনে হবে, লোকে দেখে বাহবা দেবে। এখানে তো আর তোমরা সামান্য উটপালক নয়। তোমরা সবাই হলে ফিল্মের অ্যাক্টর'—ইত্যাদি।

তিনু আমাদের থেকে হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে উটওয়ালাদের দিকে মুখ করে চোঙা মুখের সামনে এনে কাজে লেগে গেল। একটা গগনভেদী 'ভাইয়োঁ'-র পর কোনও কথা শুনতে না পেয়ে তিনুর দিকে ফিরে দেখি সে নানারকম অঙ্গভঙ্গি সহকারে দিব্যি নেতা-নেতা ভাব করে মুখ নেড়ে চলেছে, কিন্তু তার চোঙা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। অর্থাৎ ব্যাটারিটি অকেজো হয়ে গেছে। এটা যাঁর হাতে লাউডস্পিকার রয়েছে তিনি নিজে অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না, কারণ নিজে তিনি নিজের কথা স্পষ্টই শুনছেন।

এর পরে অবিশ্যি লাউডস্পিকারটা মাঝে মাঝে কাজ করলেও সেটার উপর আর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারিনি। আজকের কাজটা আমরা সকলে ভাগাভাগি করে উটওয়ালাদের মধ্যে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনও মতে সারলাম। দু'একজন করে লোক নিজেদের পোশাক ছেড়ে যুদ্ধসাজ পরতেই ক্রমে বাকিরাও তাদের দেখাদেখি তৈরি হয়ে নিল।

প্রথম কাজ শুরু হল গানের দৃশ্য দিয়ে। সৈন্যদল এখানে উটের পিঠে অনড় হয়ে বসে থাকবে। উটওয়ালাদের মধ্যে যাদের বয়স কমের দিকে তাদের একটু ছটফটে মনে হওয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হল একেবারে পিছন দিকে। সামনের দিকে রাখা হল যত মাঝবয়সী আর বুড়োদের। উট যদি এলোমেলো ভাবে দাঁড়ায় তা হলে যুদ্ধে যাওয়ার ভাবটা আসে না। 'ফরমেশন' হয় না। তাই আরও মিনিট পনেরো সময় দিয়ে তাদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হল। তার পর শুরু হল শুটিং।

সাড়ে চার মিনিটের গান। সেটা তোলা হবে অন্তত চল্লিশটা বিভিন্ন শটে, এক একটি শট্ নিতে সময় লাগবে আন্দাজ গড়ে পনেরো মিনিট করে। কিছু শটে গুপী-বাঘাকে দেখা যাবে, কিছু শটে শুধু সৈন্যদের, আবার কিছুতে গুপী বাঘা সৈন্য সব কিছুই একসঙ্গে দেখা যাবে। প্রত্যেক শট্-এর সঙ্গে সঙ্গে প্লে-ব্যাক যন্ত্রে গান চলবে, গুপী সেই গানের

সঙ্গে ঠোঁট মেলাবে, বাঘা মেলাবে ঢোলের কাঠি, আর ক্যামেরাও এদিক ওদিক চলবে গানের ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

মিষ্টিবর্ষণের আগে পর্যন্ত গানের শট্ প্রথম দিন তিন ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল। মিষ্টির দৃশ্য তোলা হবে আগামীকাল। উট এবং উটওয়ালা জয়সলমিরেই থাকবে, তাদের খোরাকি দেব আমরা।

মিষ্টির ব্যাপারটা বলার আগে একটা অন্য ঘটনা বলে নিই, কারণ এটা ঘটেছিল এই প্রথম দিনেই।

রোদ পড়ে যাওয়া পর্যন্ত কাজ করার পর সবাই যখন ঘরে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছি, উটওয়ালারা আমাদের পোশাক খুলে ফেলে তাদের নিজের পোশাক পরছে, হাল্লার সেনাপতি নধরকান্তি শ্রীমান শান্তি চট্টোপাধ্যায় উটের পিঠ থেকে নেমে হাড়গোড় সব ঠিক আছে কিনা টিপে টিপে দেখে নিচ্ছেন, এমন সময় কোত্থেকে জানি ভেসে এল এক আশ্চর্য সুন্দর বাঁশির সুর। খোঁজ নিয়ে জানলাম বংশীবাদক নাকি উটের দলের সঙ্গেই এসেছেন, যদিও তিনি সেনার পোশাক পরেননি।

লোকটিকে খুঁজে বার করা হল। মাথায় পাগড়ি, গায়ে সাদা সার্টের উপর কালো ওয়েস্ট কোট, চোখে অমায়িক, উদাস দৃষ্টি। বয়স মনে হল চল্লিশের কাছাকাছি। ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে বাঁশি— তবে একটা নয় দুটো। এই লোকটির সঙ্গে আরেকজন রয়েছে দেখলাম, তার চেহারায় বেশ চোখে পড়ার মতো বিশেষত্ব। এর পোশাকও বংশীবাদকের মতোই, তবে দৈর্ঘ্যে ইনি ছ'ফুটের উপর। গায়ের রং এত পালিশ করা মিশকালো আর কারুর দেখেছি বলে মনে পড়ে না, আর তীক্ষ্ণ নাকের নীচে এমন গোঁফজোড়াও আর কারুর আছে কিনা জানি না। গোঁফের দুটো দিক বিরাট ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো আড়াই পাক প্যাঁচ খেয়ে দুটি গাল জুড়ে বসে আছে। পরে জেনেছিলাম প্যাঁচ খুলে গোঁফ দুদিকে টেনে সোজা করলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্য হয় সাড়ে তিন ফুটের কাছাকাছি।

আমরা বংশীবাদককে বললাম, তাঁর বাজনা আমাদের দূর থেকে শুনে খুব ভাল লেগেছে— তিনি কি সন্ধেবেলা আমাদের ডেরায় এসে একটু বাজনা শুনিয়ে যাবেন ? ইচ্ছে ছিল সম্ভব হলে এই বাঁশির রেকর্ড করে আমাদের ছবিতে ব্যবহার করব। বাঁশিওয়ালা এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল।

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ জওহরনিবাসে এসে হাজির হল বাঁশিওয়ালা আর তার বন্ধু। আমার ঘরে মাটিতে কার্পেটের উপর বসে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাঁশি শোনা ও রেকর্ড করা হল। শুরুতেই অবাক হলাম দেখে যে পকেট থেকে দুটো বাঁশি বার করে দুটোই এক সঙ্গে মুখে পুরলেন শওকত আলি (নামটা আগেই জেনে নিয়েছিলাম)। ফুঁ দেবার পরে বুঝলাম কী

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে। একটা বাঁশিতে কেবল একটা ফুটো ছাড়া অন্যগুলো সব মোম দিয়ে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। এই বাঁশি কাজ করবে সানাই-এর পোঁ-এর মতো। আর অন্য বাঁশির সব ফুটোই খোলা ; এতে বাজবে সুর ! পরে জিগ্যেস করে জানলাম, এই বাঁশির নাম হল সাতারা। এর উৎপত্তি হয়েছে জয়সলমিরের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে পাকিস্তান সীমানা থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে খুড়ি নামে একটি গ্রামে। ছোট্ট গরিব গ্রাম— কিন্তু সে গ্রামের প্রত্যেকটি লোক নাকি গান বাজনায় ওস্তাদ। এই গ্রামেই নাকি উদ্ভব হয়েছিল সাপুড়ের বাঁশির— যাকে রাজস্থানে বলে বিন— যা আজকাল ভারতবর্ষের সব শহরে শুনতে পাওয়া যায়।

শওকত আলির আশ্চর্য সুন্দর বাঁশি রেকর্ড করে তাকে শোনালে পর তার মুখের ভাব হল অদ্ভুত। সে বলল 'আমার একমাত্র ভাই সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে পাকিস্তানে। তোমরা যদি আমার এ বাঁশি রেডিওতে বাজাতে পারো, তা হলে সে হয়তো সেখান থেকে শুনতে পাবে।'

শওকত আলি যতক্ষণ বাঁশি বাজাল, তার সেই বন্ধুটি চুপ করে বসে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল এর মতো নিরীহ লোক বুঝি আর হয় না। তাঁর গোঁফের বাহার আমাদের সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করেছিল, তাই এবার তাঁর-সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে হল।

পরিচয় জিগ্যেস করে যা জানলাম তাতে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ ; ইনি হচ্ছেন জাতে ভিল, নাম কর্ণ, আর ইনিই এককালে ছিলেন রাজস্থানের দুর্ধর্ষতম ডাকাত। বললেন, 'এখন আমাকে কী দেখছ— এক কালে আমার স্বাস্থ্য এমন ছিল যে একটা আস্ত জিপগাড়ি একটা কাঁধে তুলে নিতে পারতাম। দুবার আমাকে পুলিশ ধরে জেলে পোরে ; দুবারই আমি কয়েদ ঘরের জানালার লোহার শিক হাতে বেঁকিয়ে ফাঁক করে পালাই। তিনবারের বার এরা করল কী, আমাকে ধরেই আমার শরীর থেকে দুবাটি রক্ত বার করে নিল। রক্তই তো মানুষের প্রাণ সেটা গেলে আর কী থাকে বলো !'

এই ঘটনার সাত বছর পরে সোনার কেল্লার শুটিং করতে গিয়ে আবার এই কর্ণ ভিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকে প্রথমে চিনতে পারিনি, কারণ গোঁফের সেই মার্কামারা প্যাঁচটি নেই, আর শরীরও যেন আরও ভেঙে গেছে ! তার কাছে জানলাম যে, শওকত আলি নাকি তার জোড়া-বাঁশি নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেছে। এবারে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। এই এককালের ডাকাতটিও বাঁশি বাজান, আর এও এক অভিনব বাঁশি। এর রাজস্থানি নাম হল নাড়। এরও উৎপত্তি সেই খুড়ি গ্রামে। এ বাঁশি লম্বায় আড়াই হাত। বাজানোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ফুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ের গলাতেও সুর চলতে থাকে। বাঁশির স্বর আর

গলার স্বর দুটোই গুরুগম্ভীর, আর দুটো মিলে বেশ একটা গা ছম ছম করা সংগীতের সৃষ্টি হয়। এ বাঁশিও নাকি সাতারার মতোই দেশে এই একটি লোকই বাজাতে পারে, কারণ এতে দম লাগে অফুরন্ত।

গান বাজনার কথা শেষ করে এবার, হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসা যাক।

দ্বিতীয় দিন তোলা হবে গানের শেষ অংশ, অর্থাৎ গুপী যেখানে গাইছে— 'আয় আয় আয়রে আয়, মণ্ডামিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি'—ইত্যাদি।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেনাদের ঘোর কেটে যাবে, আর তারপর আকাশ থেকে নামবে মিষ্টির হাঁড়ি। এখানে বলে রাখি মিষ্টির হাঁড়ি নামার দৃশ্যে Trick photography-র প্রয়োজন হওয়াতে সেটা তোলা হয়েছিল কলকাতায়, আর তাতে নানা রকম ক্যামেরা আর ল্যাবরেটরির কারসাজি ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে সব আর তোমাদের কাছে ভেঙে বলব না, তা হলে মজা মাটি হয়ে যাবে। হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্রে কী হয়েছিল সেটাই বলি।

জয়সলমিরে এমনিতে খাবার দাবার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তবে যে জিনিসটার অভাব নেই সেটা হল ক্ষীরের মিষ্টি। শ'খানেক বড় বড় মাটির হাঁড়ি অর্ডার দিয়ে করিয়ে তাতে ওই ক্ষীরের মিষ্টি ভরে সেগুলো লাইন করে রাখা হয়েছিল সৈন্য যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে, উটের সামনের সারির প্রায় একশো গজ দূরে।

ছবিতে প্রথম দেখানো হবে গানের শেষে সৈন্যরা আকাশের দিকে দেখছে, তারপর তাদের মধ্যে 'মিঠাই, মিঠাই' বলে সোরগোল উঠবে। তারপর তারা উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে হাঁড়িগুলোর দিকে দৌড় দেবে, তারপর হাঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোগ্রাসে মিষ্টি গিলবে। এরই মধ্যে আবার পেটুক মন্ত্রীমশাইকেও দেখানো হবে, তিনিও একটি হাঁড়ির সন্ধান করছেন, এবং ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ভিড়ে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন।

ব্যাপারটা যখন সৈন্যদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন এক আজব সমস্যা দেখা দিল। আমাদের ধারণা ছিল সব উটওয়ালাই বুঝি মুসলমান, কিন্তু এখন জানা গেল তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি হিন্দু। হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেতে হবে শুনেই রব উঠল হিন্দু আর মুসলমানের হাঁড়ি আলাদা করে সাজিয়ে দিতে হবে, দুই দল এক সঙ্গে হাঁড়ি থেকে খাবে না। কেউ কেউ আবার এও বলল যে, তাদের মিঠাইয়ের রুচি নেই। এই দ্বিতীয় সমস্যা সমাধান করার অবিশ্যি কোনও উপায় নেই। মিষ্টি যারা খায়ই না তাদের দিয়ে জোর করে গোগ্রাসে মিষ্টি গেলানোর কারসাজি আমার জানা নেই। কাজেই তাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। হিন্দুদের বলা হল,

এইগুলো তোমাদের হাঁড়ি, আর মুসলমানদের বলা হল, তোমরা খাবে ওইগুলো থেকে।

তোড়জোড় শেষ করে শট্ নিতে যাব, এমন সময় দেখি আরেক কাণ্ড। সৈন্যরা যেখান দিয়ে হাঁড়ির দিকে ছুটবে সেই খোলা জায়গার মাঝখানে হঠাৎ একটা জিপ এসে হাজির। সর্বনাশ, স্বয়ং জয়সলমিরের মহারাজ এসেছেন শুটিং দেখতে— সঙ্গে আছেন মহারানী আর সাত বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। রানী বসেছেন জিপের পিছন দিকে পর্দার আড়ালে, আর রাজা বসেছেন রাজকন্যাকে কোলে নিয়ে সামনে, ড্রাইভারের পাশে। বাধ্য হয়ে তাঁকে গিয়ে বলতে হল যে তামাশা দেখার জায়গাটা বাছাইয়ে তাঁরা একটু ভুল করে ফেলেছেন। গাড়ি অন্তত ত্রিশ হাত দক্ষিণে না সরালে আমরা কাজই করতে পারব না। রাজা শুনলেন, আমাদের সমস্যা বুঝলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ি সরে গিয়ে আমাদের কাজের জায়গা খুলে দিল।

এই সব কিছুর পরেও হঠাৎ নতুন ভাবনায় মনটা খচ্ খচ্ করে উঠল। এমনি মিষ্টি খাওয়া এক জিনিস আর অনেকদিন আধপেটা খেয়ে হঠাৎ আকাশ থেকে পড়া অফুরন্ত মিষ্টি দেখে সে মিষ্টি খাওয়া আরেক জিনিস। এখানে দিশেহারা হয়ে হাভাতের মতো খাওয়ার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে রীতিমতো অ্যাকটিং-এর দরকার হবে। সে অ্যাকটিং যদি এই উটওয়ালাদের দ্বারা না হয়, তাই আমাদের অভিনেতাদের মধ্যে যাদের খাইয়ে বলে নাম আছে তাদের কয়েক জনকে চটপট মেক-আপের সাহায্যে রাজস্থানি দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে নিয়ে হাল্লার সেনার পোশাক পরিয়ে কাজে নামিয়ে দেওয়া হল।

তোমরা ছবির এই দৃশ্যে যাদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে খেতে দেখেছ, তাদের অনেকেই আসলে আমাদের লোক। তাদের মধ্যে একজন— কামু মুখার্জি (সোনার কেল্লার মন্দার বোস)—সেদিন একাই সাবাড় করে দিয়েছিল অর্ধেক হাঁড়ি মিষ্টি!